মোসলেম ও মোসলেম সাম্প্রদায়িকতা

মো: জামিলুল বাসার

ছল্লে, ছল্লা, ছালাম, ছালাত, আছলাম, ইসলাম, মোমেন, মোত্তাকিন, মোসলেম ইত্যাদি শব্দগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার মূল অর্থ: শান্তি, শান্ত, শান্তি বাদ, প্রশান্ত, প্রলিপ্ত, ভিরু, ধীর, স্থির, সুঠাম, অচল, অটল, বিশ্বস্ত, ভক্ত, সমর্পিত, নিবেদিত, বিক্রিত ইত্যাদি। একক ও সহজ-সরল কথায় ভদ্রলোক বা আদর্শবান পুরুষ বলা যেতে পারে অথবা ধার্মিকও বলা যেতে পারে।

গুরুর চরম বাধ্য ও বিশ্বস্ত তাই আদর্শবান ভক্তের [বিশ্বাসীদের] অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সৎ, সুন্দরম, পরিশ্রমী, ন্যায়বাদী, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী, পরোপকারী; উদার, মহান, ত্যাগী, নীতিবান, ক্ষমাশীল, দয়াশীল, ধৈর্য্যশীল, বীর্য্যশীল;জ্ঞানী, গবেষক, প্রগতিশীল ইত্যাদি যাবতীয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই ভদ্র বা আদর্শবান বলে সমাজে স্বীকৃত হয়।

এরা মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার; চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, বাটপারী; হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, এবং উচ্ছৃংখল বিচ্ছৃংখল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকারী নয়, নয় প্রতিশোধ পরায়ণ নয়। এসমস্ত লোক দ্বারা শত্রু-মিত্র বা সমাজের কারো ভয়, বা ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা থাকে না। অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় জ্ঞান গুণসম্পন্ন ও সৃষ্ট যাবতীয় অজ্ঞানতা ও দোষ বিমুক্ত ব্যক্তিগণই সমাজে ভদ্র বা আদর্শবান ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। এদেরকেই কোরানে 'মুসলিম' বা 'আর্য' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরা আল্লাহর নির্ধারিত সংবিধানের কাছে চির সমর্পিত, নিবেদিত, বিশ্বস্ত, KwVb cwik^gx ও চেতনাপ্রাপ্ত। এরা কখনও এবং কোন অবস্থায় আক্রমণ বা প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না; কিন্তু আত্মবিশ্বাস, নীতিবোধ ও আত্মরক্ষায় এরা অটল অবিচল। কোন কিছুর অজুহাতে আল্লাহর নির্ধারিত সংবিধান লঙ্ঘন করে না। এদেরকেই আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেছেন। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত, জন্মগত ও জাতিগত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদিদের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা সমাজ কোন দিক থেকেই নিরাপদ নয়।

আজকের ধর্ম ও ধার্মিক মানেই আকার আকৃতি সর্বস্ব পেশাদারী মোনাফেক! আর নেতা মানেই পেশাদারী প্রতারক!

পক্ষান্তরে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে খুব কম সংখ্যক হলেও এমন কিছু লোক আছেন, যাদের থেকে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ; আল্লাহর একত্ববাদে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পরার্থে নিবেদিত; জীবন ধারণে একান্ত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সহায়-সম্পদ কুক্ষিগত করে সমাজ-দেশের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে না। এদের দ্বারা কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কল্পনাই করা যায় না। এরাই আল্লাহর দরবারে প্রকৃত মুসলিম তথা ভদ্র, আদর্শবান বা ধার্মিক।

'ধার্মিক', 'ভদ্র', 'আদর্শবান' ইত্যাদি এবং ওদের বিপরীত শব্দগুলি বলতে যেমন প্রচলিত ধর্মভেদ বা জাতিভেদ বুঝায় না, তদ্রুপ দূর অতীতের নির্দিষ্ট কোন কালে হিন্দু, [আর্য্য বা সনাতন ধর্মী] মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা ইহুদি বলতেও হালের ধর্মভেদ বুঝাতো না। ভেদ ছিল: ধার্মিক-অধার্মিক, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ভদ্র-অভদ্র, বোধ-নির্বোধ, শৃংখল-উচ্ছৃংখল, আর্য-অনার্য, সুর-অসুর, তাল-বেতাল, কল্যাণ-অকল্যাণকামী দলের। কিন্তু কালের বিবর্তনে ঐ সমস্ত সুন্দরতম ও গুণগত নামগুলি সকল জাতির মৌলবাদিগণ ব্যক্তি ও দলের জন্মগত, জাতিগত সাম্প্রদায়িক নামে পরিণত করেছেন: যাতে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ধার্মিক-অধার্মিক ইত্যাদি পার্থক্য করে না বলেই আল্লাহর দরবারে ওরা সকলেই সমান।

মুসলিম, ভদ্র, আদর্শ বা ধার্মিকদের গুণাগুণ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কোরানসহ সকল জাতির মূল ঐশী গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। সেগুলি আপন আপন ভাষায় পড়ে, জেনে, বুঝে অতঃপর জীবনের পরতে পরতে প্রতিফলিত করে অতঃপর অন্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রায় দিবে যে, 'আমি ধার্মিক কি অধার্মিক'; সাম্যবাদী কি সাম্প্রদায়িক; শান্তি বাদী কি অশান্ত বাদী। কয়েকটি আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত ধারাগুলি আদর্শবান বা মোসলেমদের উল্লেখযোগ্য অন্যতম প্রধান ও পূর্বশর্ত:

১. অল্লাজীনা ইউ'মিনুনা------ইউকিনুন। উলা-ইকা-----মুফলীহুন। [বাকারা-৪, ৫] অর্থ: এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং ভবিষ্যতে [পরের কালে] যা অবতীর্ণ হবে তাতে যারা বিশ্বাস করবে; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে বলবৎ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।
২. আল্লাজীনা ইউ'মিনুনা বিলগ্বাইবি-----ইউনফিক্বুন। [বাকারা-৩] অর্থ: যারা অদৃশ্যে [ভবিষ্যতে] বিশ্বাস করে, প্রার্থনা অনুযায়ী কাজ করে, [অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে প্রার্থনা করে] এবং তারা যে সহায় সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে অভাবীদের অভাব পূরণ করে।
৩. অল্লাজীনা আ-মানু-----খালিদীন। [বাকারা-৮২] যারা বিশ্বস্ত তার সহিত সৎ পরিশ্রম [গবেষণা] করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।
৪. ক্বু-লু- আ-মান্না বিল্লা-হি---মুমিমুন। [বাকারা-১৩৬] অর্থ: তোমরা বল! 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করি না এবং আমরা

তার নিকট আত্মসমর্পণকারী [মোসলেম]।

৫. লাইছাল বিররা-----মুত্তাক্বু-ন। [বাকারা-১৭৭] অর্থ: পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, ভবিষ্যৎকাল, ফিরিস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত রেখে পবিত্র হলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করলে; অভাব, দুঃখ, কষ্ট ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধার্মিক।

৬. অলা- তাবিছুল হাক্বা------তা'লামুন। [বাকারা-৪২] অর্থ: তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করিও না।

৭. অ আক্বীমুচ্ছালাতা অআ- তুয্যাকা-তা অরকা'উ মা'আররা-ক্বি-ঈন। [বাকারা-৪৩] অর্থ: প্রার্থনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করে পবিত্র হও [অভাবহীন] এবং আদর্শ ভক্তদের সঙ্গে একতাবদ্ধ থাক।

৮. অইজ আখাজনা-----মুরিদুন। [বাকারা-৮৩] অর্থ: স্মরণ কর! যখন ইসরাইল সন্তানদের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা, পিতা, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবে এবং মানুষের সহিত ভদ্র নম্র ব্যবহার করবে। প্রার্থনা বলবৎ রেখে পবিত্রতা অর্জন করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

৯. অমাল্লাম ইয়াহকুম-------কাফেরীন, ফাছেক্বীন, জালেমীন। [মায়েদা-৪৪-৪৯] অর্থ: আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে আনুযায়ী যারা বিচার মীমাংসা করে না তারাই কাফের, ফাছেক ও জালেম।

১০. আরাইতাল্লাজী-------মা-উন। [মাউন: ১-৭] অর্থ: তুমি কি দেখেছ, যে ধর্মকে অস্বীকার করে? সে ঐ ব্যক্তি যে অসহায়কে রূঢ় ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবিদের সাহায্য করে না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সকল প্রার্থনাকারীদের [নামাজীদের]; যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন ও বে-খেয়াল। এরা লোক দেখানো নামাজ করে। এরাই পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্য সহয়োগিতা থেকে বিরত থাকে।

১১. ইন্নাল্লাজীনা------বারিয়াৎ। [বায়্যিনা-৭] অর্থ: যারা ভক্ত [মোমিন] ও সৎপরিশ্রমী [গবেষক, বৈজ্ঞানিক] তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

মোসলেম সাম্প্রদায়িকতা

মহানবীর আগমন পূর্ব আরবভূমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পৌত্তলিক দেশ ছিল। শুধু তার আগমনের পূর্বেই নয়, হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীমের আমলও পৌত্তলিকতাবাদ কঠিনভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোরানই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ [দ্র: আনআম-৭৫,৭৬; আম্বিয়া- ৫৭, ৬০]। এমনকি হযরত মুছার আমলেও এই পৌত্তলিকতাবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় সূরা বাকারার ৯২ ও ৯৩ আয়াতে। অতএব ভারতবর্ষে পৌত্তলিকদের আগমন যে আরব-আফ্রিকা থেকেই তা ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত। মূলত মহাদেব, মনু, কৃষ্ণ, শীব [সা] নবীগণ পৌত্তলিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা নন তাও নিশ্চিত। বরং মূর্তি পুজার বিরুদ্ধেই যে তাদের আগমন হয়েছিল তা তাদের ৪ খানি মূল গ্রন্থেই সাক্ষ্য বহন করে, আর সর্বজনবিদিত হযরত শীব/কৃষ্ণের একটি বাণীই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট: 'একমেবা দ্বিতীয়ম', 'এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি' অর্থ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আরব মোসলেমগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পৌত্তলিক, পূর্ব পুরুষদের উলুধ্বনী আজও তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। অতএব আরবদেশ থেকেই যে ভারতবর্ষে আমাদের পূর্ব পুরুষ পৌত্তলিকদের আগমন তাতে আর সন্দেহ নেই, এটা নুতন কোন ধারণা বা আবিষ্কারও নয়।

রাসূল [সা] পূর্ব আরবীয় পৌত্তলিকগণ শত শত গোত্র, দল, উপ-দলে বিভক্ত ছিল এবং উপাসনার জন্য প্রত্যেক দলেরই স্বতন্ত্র মূর্তি ছিল। মক্কার কাবা ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি প্রত্যেকটি দল উপদলের প্রতীক ও পরিচয় বহন করতো। এরা আজকের মত অর্থ সম্পদের চেয়েও দলীয় মৌলবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিযোগিতায় এবং তাকে কেন্দ্র করেই অহরহ যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি ও দলাদলি করে জীবন কাটাতো। ঐতিহাসিকদের অভিমত: জ্ঞান বা গুণ নয়, একমাত্র দাঁড়িই ছিল নেতৃত্বের প্রধান মাপকাঠি; যার দাড়ি যত বড় সে তত বড় নেতা হতো। এসমস্ত ইতিহাস স্বাধীনতাপূর্ব স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকতো।

এহেন তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগে হযরত মুহম্মদের [সা] আবির্ভাব হয়; একক আল্লাহর উপাসনার মন্ত্রে দলীয় মূর্তি ও মন্দির পবিত্র কাবা ঘর থেকে বিতাড়িত করে একত্ববাদের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, ধর্ম-কর্মের নিরীখে একটি জাতির গোড়াপত্তন করেন। একক অভিন্ন সাম্যবাদী গঠনতন্ত্র কোরানের অধীনে। [সকল নবীগণই অনুরূপ করেছেন]। যাদের নাম ও পরিচয় হয় একমাত্র 'মোসলেম' বা আদর্শবান নামে। এদের প্রতি আল্লাহর-রাসুলের বজ্র কঠিন নির্দেশ:

১. অ'তাছিমু বিহাবলীল্লা-হি জ্বামিয়া অলা তাফাররাক্বু [ইমরান-১০৩] অর্থ: এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু [কোরান] মজবুতভাবে ধারণ করো। তোমরা দল-উপদলে বিভক্ত হইও না।

২. ইন্নাল্লাজীনা ফারাক্বু------ইয়াফ আলুন। [আনআম- ১৫৯] অর্থ: যারা ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি করেছে/করবে ও দল

উপদলে বিভক্ত হয়েছে/ হবে, তাদের উপর আপনার কোনই দায়িত্ব থাকলো না/ থাকবে না। তাদের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরেই ছেড়ে দিন/ দিবেন। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ তলব করবেন।

৩. মিনাল্লাজীনা-----ফারিহুন। [রূম-৩২] অর্থ: যারা ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করেছে/করবে ও দল উপ-দলে বিভক্ত হয়েছে/হবে, তারা নিজস্ব মতবাদ নিয়েই মত্ত রয়েছে/রবে।

অতীতের দল উপ-দলের ধর্ম বিভক্তকারীদের কঠিন শাস্তি র উপমা উত্থাপন করে পরিস্কারভাবে ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আল্লাহ-রাসূ ল সতর্ক করে দিলেন:

৪. অলা তাকুনু-----আজীম। [ইমরান-১০৫] অর্থ: তোমরা অতীতের মত হইও না। যারা তাদের নিকট স্পষ্ট বিধান আসার পরেও নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য করে দল উপ-দলে বিভক্ত হয়েছে; তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

মহানবীর দীর্ঘ ২২ বৎসরের কঠিন তপস্যা, ততোধিক কঠিন ত্যাগ তিতিক্ষা ও কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলেন 'মোসলেম' জাতি। এরা মারা-মারি, রক্তা-রক্তি, যুলুম-সন্ত্রাসী করবে না, নিজেদের মধ্যে মতভেদ, দলাদলি করবে না, অহঙ্কার করবে না, বিদ্বেষ, লোভ, হিংসা, প্রতি-হিংসা, আক্রমণ ও প্রতিশোধ পরায়ণ হবে না। কোন কিছুর অজুহাতে সমাজে গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করবে না। ধৈর্যশীল, বীর্যশীল, ত্যাগী, সেবাবাদী, উদার ও বলিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী হবে, অন্ধ বিশ্বাস ও সংযমে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করবে; আক্রমণ করবে না কিন্তু আক্রান্ত হ'লে কঠিন হিমাদ্রির মত অচল-অটল প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। একক আল্লাহর ইবাদত করবে। আল্লাহর কেতাবের অনুসরণে নিজেদের মধ্যের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করবে।

কিন্তু তার ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলো অমানিশার পুরানো সেই কালো ছায়া। ঐতিহাসিকদের মতে ওফাতের ক্ষণিক পূর্বে মহানবী [সা] মনের দুঃখে ক্ষোভে ঘনিষ্ট সাহাবাদের আপন কক্ষ থেকে তাড়িয়ে দিলেন; ওফাতের পরে তিন দিন পর্যন্ত তাঁর লাশ মোবারক কবরস্থ হয়েছিল না।

মহামতি দুরদর্শী হযরত আবুবকর [রা] মোসলেম জাতির খলীফার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে উপরোল্লেখিত নির্দেশসহ কোরানিক বিধান যারপরনেই সমুন্নত রাখেন। কঠিন সাম্যবাদী হযরত ওমর [রা] একই ধারায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপন সন্তানকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেন; আপন জীবন উৎসর্গ করে শাহাদৎ বরণ করেন। ধীরে ধীরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বিশ্বে অন্ধকারের পুন: সূচনা হয়। ত্যাগী উদার হৃদয়ের অধিকারী হযরত ওসমান [রা] এই মোসলেম জাতির হাতেই নজরবন্দী হলেন, অতঃপর আল্লাহর কোরান পড়া রত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন সম্মানিত সাহাবা, তাবেঈনদের [রা] হাতেই। কোরান রঞ্জিত হয় খলীফার জীবন দেয়া রক্তে। অতীতের পৌত্তলিকদের সেই বিভৎস পুরানো দলাদলি, হিংসা, প্রতি-হিংসার দাবানল জ্বলে উঠে। কিন্তু এবারের দাবানলের উৎস ধর্ম নয় ক্ষমতার লোভ। রাজ্যময় শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ধৈর্য্য, শৈয্য, বির্য্যশীল, বীর বিক্রম হযরত আলী [রা] ৪র্থ খলীফা, দাবানল নির্বাপণের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাধ সাধে ঘনিষ্ঠ সাহাবা মুয়াবীয়া-এজিদ [রা] আর আমর এবনুল আস [রা]। শুরু হয় পুনঃ রক্তক্ষয়ী মরণ যুদ্ধ। সাহাবা [রা] বনাম সছাহাবা [রা]। মোসলেম বনাম মোসলেম।

হযরত আলীকে [রা] কেন্দ্র করে মুসলিম ইতিহাসের সর্বপ্রথম দল আত্মপ্রকাশ করে খারেজী নাম ধারণ করে। হযরত আলীর [রা] শাহদাতের কিছু পূর্বে অথবা পরে জন্ম হয় ইসলামের দ্বিতীয় দল শীয়া নাম ধারণ করে। এরা উভয়ই মোসলেম বটে! কিন্তু আল্লাহ-রাসূ ল প্রদত্ত একমাত্র 'মোসলেম' খেতাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ধারণ করলো 'খারেজী মোসলেম', 'শীয়া মোসলেম' নামে।

ছিপ্পিনের যুদ্ধে, মুয়াবীয়ার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে, কোরানের বুকে নেজা বল্লম বিদ্ধ করে, হযরত আলীর [রা] সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের আহ্বানে, অবস্থার পরিপেক্ষিতে হযরত আলী [রা] সম্মত হলে, তার দলের যে অংশ প্রতিবাদ মুখর হয়ে দল ত্যাগ করে, ওরা প্রধানত: হযরত মুয়াবীয়ার [রা] ঘোর বিরোধী ছিলেন, হযরত আলীর [রা] প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এরাই খারেজী। অতঃপর হযরত আলীর [রা] সমর্থকগণ শীয়া নাম ধারণ করেন।

কিন্তু ছুন্নীগণ কখন! কার নেতৃত্বে! কোথায়, কিভাবে! কিসের যুক্তিতে বিভক্ত হলো! তার কোন মৌখিক কি ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না! অর্থাৎ আমাদের ছুন্নীদের কোন জন্ম ঠিকানা বা ইতিহাস নেই! তবে হিসাব নিকাশে এটাই পাওয়া যায় যে, তৎকালীন মোসলেম জাতি প্রধানত ৩টি দলে বিভক্ত হয়, যথা: (১) খারেজী (২) শীয়া ও (৩) মুয়াবিয়া-এজিদের [রা] ক্ষমতাসীন দল।

এই ক্ষমতাশীন দল নবী বংশকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিষ প্রয়োগে, হত্যা, খুন, গুম্, লুণ্ঠণ, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে এমনভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা অদ্যাবধি ১৫ শত বৎসর যাবৎ বলবৎ রয়েছে। আমাদের ছুন্নীদের লিখিত বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষের' আলোতে:

"আলী [রা] ইব্ন আবী তা'লিবের বংশধরদের অধিক সংখ্যকই ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিলেন। তাঁদের দু:খের কাহিনীতে মুসলিম ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে--- ।--- আলী [রা] বংশের যে সকল লোক নির্যাতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন, মাসউদি, মুরাজ ৭ম খন্ডে ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাদের একটা তালিকা পাওয়া যায়।---উমাইয়া তথা এজিদ বংশের কেবল ২য় উমার ইব্ন 'আবদি'ল আজীজই নবী বংশের জন্য বিবেকের দংশন অনুভব করেন। নবী বংশ তাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া

তিনি ফাতিমার পক্ষে আলী [রা] এর যে সকল বংশধর মদিনায় বাস করিতেন, তাদের মধ্যে ১০ হাজার দিনার বিতরণ করেন। [নবী বংশকে ভিক্ষা দান বটে!]---কিন্তু আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় হইতে আবার নির্যাতন শুরু হয় এবং আল-মুন্তানসি'বের আমল পর্যন্ত বহাল থাকে। আল মুতাওয়াক্কিল কারবালাতে আল- হুসায়ন [রা] এর কবর বিধ্বস্থ করিয়া দেন ও তথায় লুণ্ঠন চালান---" [দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড; পৃঃ ৮১, ৮২]।

এই ক্ষমতাসীন মুয়াবীয়া-এজিদের [রা] তৃতীয় দলের কোন নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না! পক্ষান্তরে বিশ্বে আজও শুধু 'মোসলেম' নামধারী একটি দল বা মানুষও খুঁজে পাওয়া যায় না!

অতএব, পরবর্তীতে এরাই কোন এক সময় ছুন্নী নাম ধারণ করেছে তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। আধুনিক ছুন্নী পেশাদারী পন্ডিতগণ এই কলঙ্ক ঢাকার জন্য প্রচার শুরু করেন যে, 'হযরত আবুবকরের দলই ছুন্নীর দল'; যদিও তাদের এটা যুক্তি ও প্রমাণবিহীন নিছক বালসুলভ কল্পনা মাত্র ! যেহেতু চার খলীফাগণ উল্লেখিত কোরানের বজ্র কঠিন নির্দেশ জানতেন, সম্মান করতেন এবং মানতেন বলে আল্লাহ-রাসূল প্রদত্ত্ব 'মোসলেম' নামের শুরুতে অতিরিক্ত বিশেষণ যুক্ত করে আলাদা কোন কওম বা দলের গোড়াপত্তন করতে পারেন না এবং করেন নি। অতএব হযরত আবুবকরের [রা] নামে এহেন মিথ্যারোপণ, অতঃপর তাকে আংশিক বা দলীয় খলীফা প্রমাণের ঘৃণ্য ও ব্যর্থ অপচেষ্টা মাত্র। এজিদ-মুয়াবীয়ার [রা] গোষ্ঠী যদি ছুন্নী না হয়ে থাকে, তবে তাদের পরিচয় কি! যদি ধরে নেয়া যায় যে, ঐ দল একমাত্র 'মোসলেম' নামেই পরিচিত ছিল! তবে আজ সে দলের অস্তিত্বের সন্ধান কোথায়! আর ছুন্নীদের উৎস কি! পরিচয়ই বা কি! এখানে বলে রাখা ভালো যে, মৌলবাদের ধারণা যে, রাছুলের সুন্নাত যারা পালণ করে তাদেরকেই সুন্নী বলা হয়।' কিন্তু এটা অমূলক শিশুসুলভ ধারণা মাত্র। সুন্নাত অর্থ আইন, বিধান,সংবিধান; অতএব রাছুলের নিজস্ব কোন বিধান বা সুন্নাত ছিল না এবং তিনি কখনও দাবিও করেন নি। তিনি আল্লাহর সুন্নাত প্রাপ্ত হয়েছেন, উহাই পালণ করেছেন এবং উহাই প্রচার করেছেন। ইহার বাহিরে কোন কিছু রচনা করলে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর হৃদয় ধমনী কেটে ফেলতেন, কোরান দেখুন:

অলা তাকব্বালা আলাইনা----হাজেজীন। [হাক্কা- ৪৪-৪৭] অর্থঃ সে যদি আমার নামে নিজর তরফ থেকে কিছু রচনা করতো তবে, অবশ্যই তার দক্ষিন হস্ত ধওে ঘাড়ের শিরা কেটে ফেলতাম এবং তোমরা তাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারতে না।

এর পর তড়িৎ বেগে জন্ম হয় অসংখ্য দল-উপদলের যেমনঃ রাফেজী, মোতাজেলী, ওহাবী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বেলী, মালেকী, লা-মজহাবী, বাহাই, আগাখানী ইসমাইলিয়া এবং শীয়াদের অসংখ্য উপ-দল।

একটি ধর্মীয় কওমের নামকরণ, নামের পরিবর্তন, পরিবর্ধনের অধিকার রাখেন একমাত্র নবী-রাসূলগণ। পক্ষান্তরে, মোসলেম জাতির অসংখ্য দল-উপদলের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি ও দলীয়- উপদলীয় ইমামগণ! তারা আল্লাহ-রাসূল প্রদত্ত 'মোসলেম' কওমকে এমনভাবে বিভক্ত করে ফেলেছেন যে, আজ বিশ্বে নিক্ষাদ 'মোসলেম' নামে একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা'হলো খারেজী মোসলেম, রাফেজী মোসলেম, ছুন্নী হানাফী মোসলেম, ছুন্নী হাম্বেলী মোসলেম, ছুন্নী ওহাবী মোসলেম, ছুন্নী আহমদীয়া মোসলেম ইত্যাদি; শীয়া যায়েদী মোসলেম, শীয়া গুলাতি মোসলেম, শীয়া দুরুজ ফিরকা মোসলেম, শীয়া ইছনে আশারিয়া মোসলেম, ইত্যাদি; উপরন্তু উহাদের অসংখ্য উপদল। এরা সকলেই স্ব স্ব দলকে সত্য, সঠিক বলে দাবী করে থাকেন এবং পরস্পরকে অমুসলিম, কাফের, মোরতাদ বলে ফতোয়া দেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমূহ দল-উপদলগুলি যে কোরানের মৌলিক নির্দেশ অমান্য করে সীমা লঙ্ঘন করেছেন, কোরানই তার জলন্ত প্রমাণ।

রাসূল ছিলেন মাত্র 'মোসলেম' তাঁর প্রকৃত অনুসারিগণও পরিচিত হবেন 'মোসলেম' নামে। এটাই তাদের একমাত্র পরিচয়। অতএব অতিরিক্ত বিশেষণ নামধারী মোসলেমদের উপর আল্লাহ-রাসূলের কোন দায়-দায়িত্ব নেই! অর্থাৎ তারা মহানবীর শাফায়াত থেকে চির বঞ্চিত! তা উল্লেখিত কোরানের নির্দেশগুলি নিশ্চিত ও সন্দেহহীন করেছে। সুতরাং এই কোরানও তাদের নয়! যেহেতু তারা ওটি অস্বীকার করে রাছুলের নামের দোহাই দিয়ে স্ব-স্ব লিখিত দু'নম্বরী গ্রন্থ হাদিস, ফেকহা ইত্যাদির আলোকে দল-উপদলে ভাগ হয়ে প্রকারান্তরে কথিত ইমামদের নবী বা উপ-নবী হিসাবে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবেই স্বীকার করে নতুন নাম ধারণ করেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এই দল-উপদলগুলি আদিকাল থেকেই পূর্ব পৌত্তলিকতাবাদের মতই পুনঃ অহরহ ক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী ঝগড়া-ফাছাদ, খুনাখুনী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-সন্ত্রাসে লিপ্ত রয়েছেন। এই যুদ্ধ এড়াতে গিয়ে ৪ মোজাহাব ৪ ফরজ বলে স্বীকৃত হয়। যদিও একে অন্যের দৃষ্টিতে কমবেশি মতভেদ ও কওমী নামের পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথও খোলা ছিল না! তার একমাত্র কারণ লাঠি-শোঠা, দলীয় বাহুবলে, কোন দলই পিছিয়ে ছিল না। আহম্মদিয়াগণ বিদেশের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যে হারে শক্তি বৃদ্ধি করছে, তাতে আশু প্রজন্মে ৫ বা ৬ [ওহাবী] মোজাহাব ৬ ফরজ ঘোষণা দেয়ার বা হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অতঃপর অপেক্ষায় আছে ৭ম মোজাহাব; যারা আল্লাহ-রাসূলের শান্তিবাদী ধর্মকে সন্ত্রাসবাদী ধর্মে পরিচিত করতে বদ্ধপরিকর!

কোরানের আলোতে আমাদের দল-উপদলের দাবী-দাওয়াগুলি 'হালাল' প্রমাণ করা সম্ভব নয় জেনে, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দলের দাবীর পক্ষে-বিপক্ষে হাদিস রচনা করেছেন; একটি উদাহরণ দেখুন:

রাসূল [সা] বলেছেন, "আমার উম্মতে মুহম্মদ এবনে ইদ্রীছ [শাফেঈ] নামে একটি লোক জন্মাবে। সে আমার উম্মতের

পক্ষে ইবলিস অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী হবে, পক্ষান্তরে আমার উম্মতে আর একজন লোক হবেন, তাকে আবু হানিফা বলে সম্বোধন করা হবে। তিনি হচ্ছেন আমার উম্মতের প্রদীপ। [বোখারী]। হাদিসটি অনেকে বাস্তবতার তাড়নায়, বিবেকের দংশনে জাল, মৌজু বা হাছান, জৈফ [নকল, মিথ্যা, দুর্বল, পুরানো] হাদিস বলে ক্ষেত্র বিশেষে মন্তব্য করে থাকেন। যদিও বিশেষ করে বোখারীর হাদিসের উপর সাধারণের হস্তক্ষেপ বা বিরূপ মন্তব্য মৌলতন্ত্রে অধিকার দেয় নি, স্বীকৃতও নয় জেনেও এই ঘোরতর স্ব-বিরোধী মন্তব্যটি করে থাকেন।

চার মোজাহাব চার ফরজ ঘোষণাটির পিছনে দল চতুষ্ঠয়ের একটি সু [?] উদ্দেশ্য নিহিত ছিল; তা হলো, সমগ্র ছুন্নীদল যেন আর কখনও নুতন কোন দল বা উপ-দল প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ না পায়। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওহাবিয়া নামে ছুন্নীদের মস্তক টিউমারসম আর একটি উপ-দলের জন্ম হয়ে। এরা ছুন্নাতে মোহাম্মদী মোসলেম বা তাবলীগ জামাতাল মোসলেম নামেও পরিচিত। প্রধানত ছুন্নীদের শরিয়তের স্তম্ভ ৫টি: কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত; পক্ষান্তরে ছুন্নী ওহাবীদের শরিয়তের স্তম্ভ ৬টি: কলেমা, নামাজ, এলম ও জিকর, একরামুল মোসলেমীন, নিয়ত ও তবলীগ। উভয়ের শরিয়তের স্তম্ভের এই সুদূর প্রসারী পার্থক্য থাকা সত্তেও উভয়ই ছুন্নী বলেই দাবী করে থাকেন! এই ছুন্নী বনাম ছুন্নীদের মধ্যে প্রায় দেড় শত বৎসর যাবৎ রক্তপাত তথা সাম্প্রদায়িক খুনাখুণী চলে; বর্তমানে ছুন্নী তবলীগ জামাত কচ্ছপ বা শামুক নীতি গ্রহণ করায় যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে গেছে। প্রকাশ থাকে যে, আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাত মোসলেম নামে ছুন্নীদের আর একটি উপ-টিউমার রয়েছে। তাকে ছুন্নী ওহাবীদের টিউমারও বলা যায়। অতঃপর ১৮ শতকের শেষ দিকে আহমদীয়া নামে আর একটি উপদল, ছুন্নী খেতাব বর্জন করে, মির্জা গোলাম আহম্মদ সাহেবের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে, যারা কাদিয়ানী নামেও পরিচিত। ধীরে ধীরে তারা অমুসলিমদের পৃষ্টপোষকতায় আন্তর্জাতিক সমর্থন ও স্বীকৃতি লাভ করে। নবী দাবি ছাড়া সুন্নীদের সাথে আহম্মদিদের আর কোন পার্থক্য নেই। নবী আসে ধর্ম সংস্কারের জন্য কিন্তু মির্জা গোলাম আহম্মদ সাহেবের ধর্ম সংস্কারের তিল পরিমাণও স্বাক্ষর নেই।

ধর্ম বিশ্বে সম্মিলিত মোসলমানগণ সংখ্যার দিক থেকে সম্ভবত তৃতীয় স্থানে থাকলেও অন্তঃ-কলহ, মতভেদ, খুনাখুনী, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার সংখ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে! এহেন অবস্থায় আহমদি বা শীয়া, ছুন্নী, ওহাবী ইত্যাদি পরস্পর কাফের, মোরতাদ ফতোয়া দিলেও মূলত এরা সকলেই একই অপরাধের আসামী; কারণ এরা সকলেই কোরানের মৌলিক নির্দেশ অমান্য করে মূল 'মোসলেম' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ছুন্নীগণও নবী বা উপ-নবীর [?] মাধ্যমে স্ব-স্ব কওমের নাম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেন; যদিও বিষয়টা তারা মৌখিক বা কাগজ কলমে বা প্রচারণায় স্বীকার না করলেও বাস্তব দর্শন তথ্যে তা প্রমাণিত। কারণ কোন নবী ছাড়া উম্মতের বা কওমের নাম পরিবর্তন করার অধিকার অন্য কারো নেই, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ছুন্নীদের মধ্য থেকেই আহমদীয়াদের জন্ম হয় বলে ছুন্নী সম্প্রদায়ের স্বার্থে চরম আঘাত হানে এবং তারা বিব্রতবোধ করেন। আর সে কারণেই পাকিস্তানী ছুন্নী সরকার, ক্ষমতার ঘৃণ্য স্বার্থে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেন। উল্লেখিত কোরানের ঘোষণার আলোকে শীয়া, ছুন্নীগণ যে দোষে দোষী, ঠিক সেই একই দোষেই আহমদীয়াগণও দোষী; যদিও উভয়ের বিশ্বাস ও মতের একটি মাত্র পার্থক্য। বস্তুতঃপক্ষে কোন দেশ বা দল উপ-দলগুলির এমন কোন কোরানিক অধিকার বা দায়িত্বও নেই যে, নব্য বা পুরানো, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোন দল বা উপদলের বিশ্বাসের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করা বা অমুসলিম ঘোষণা করা। প্রকৃত পক্ষে মোসলেম-অমোসলেম, ধার্মিক-অধার্মিক, ভদ্র-অভদ্র ইত্যাদি ব্যক্তি ও দলীয় দাবী বা রায় প্রদান বর্বর অত্যাচার মাত্র। তবে ব্যক্তি বা দল স্ব-স্ব পরিচয় পেতে পারে কোরানের আলোকে। নিখুত ও নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে কোরান, ফোরকান, মিজানের প্রত্যক্ষ অনুসরণে। আর পারে নিরপেক্ষ, নির্দলীয়, নিঃস্বার্থ তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞানী ব্যক্তি এবং একমাত্র 'মোসলেম' [আদর্শ] ছাড়া যার অন্য কোন দাবী-দাওয়া নেই, অতঃপর দূরদর্শী সর্বজন স্বীকৃত ও সমর্থিত প্রকৃত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী; কিন্তু উহা কল্পনাই মাত্র, এমন লোক দুনিয়ায় একজনও নেই। পরিশেষে সকল দল উপ-দলের সতর্কতা ও সংশোধনের জন্য এ সম্বন্ধে আল্লাহ-রাসূলের আরো দু'টি নির্দেশ বর্ণিত হলো,;মানা না মানা পাঠকের নিজস্ব বিষয়:

১. শারাআ লাকুম------আলাইহে মাইউন্নীবুন। [শুরা-১৩] অর্থ: তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সেই ধর্মই, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে-আর আমি অহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম মুছা ও ঈসাকে: এই বলে যে, তোমরা ধর্ম ধারণ করবে এবং উহাতে দলাদলি ও মতভেদ সৃষ্টি করবে না।
২. অমা- তাফাব্বাকু-----বাইনাহুম। [শুরা-১৪] অর্থ: উহারা জেনে শুনেই কেবলমাত্র পরস্পর হিংসা বিদ্বেষের কারণেই নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও মতভেদ ঘটাচ্ছে/ঘটাবে।

বিশ্বাসের একটি অস্তিত্ব ও রূপ রেখা আছে, আছে চরিত্র ও বিষয়বস্তু। সাধারণত মৌখিক বিশ্বাসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অস্পষ্ট। যেমন: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মি: ডব্লিউ. বুশ; বিশ্বের সকলেই তা একিন করেন। নবী-রাসূল ও আল্লাহকে, ধর্ম নিয়ে যারা ঝগড়া-ফাছাদ, মারামারি, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে, আপন সমাজ তথা দেশে-বিদেশে অহরহ গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করে চলছেন, তারা সকলেই বিশ্বাস করেন। কোরান যে মোসলেমদের ধর্মীয় গ্রন্থ, বেদ-গীতা হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ, তোরাহ-

ইঞ্জীল ইহুদি, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি বিশ্বের সকলেই পরস্জ্র একিন, স্বীকার করেন; কিন্তু স্ব-স্ব অনুসরণ ও অনুশীলনের বিশ্বাস, কম/বেশি পার্থক্য বটে! প্রকৃত সত্য ও বিশ্বাস কিন্তু একক ও অভিন্ন। বিশ্বাসটি শান্তিপূর্ণ কর্মপ্রেরণা ও প্রকরণের মাধ্যমে অস্তিত্বের রূপ-রেখায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, সে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের তফাৎ নেই বলেই মনে হয় এবং তার ফলাফলও অনুরূপ বটে।